সন্ধিপূজা

স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ

পরমপিতার প্রতি হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি, সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিগুরু নিম্নোক্ত কয়েকটি অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিতে :

''তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান
তুমি ধন্য ধন্য হে।''

প্রাণের দানই জীবের প্রতি শ্রীভগবানের সর্বোৎকৃষ্ট দান। দানের অনুষঙ্গেই আসে প্রতিদান। ফললাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। চেতন ঈশ্বরই ফলদানে একমাত্র সমর্থ। তিনি শুধু জীবকে কর্মানুযায়ী ফলটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হন না, কীভাবে সে ফলভোগ করবে তারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তিনিই করেন। সীমিতশক্তির মানুষের পক্ষে কিছু কিছু কর্মসম্পাদন সম্ভব হলেও ভোগ্যপদার্থ সৃষ্টি তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তাই জীবের প্রতি নিতান্ত করুণায় তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন এবং ভোগ্যবিষয়ের সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর একই করুণাধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই জগৎ ও ভোগ্যপদার্থের সৃষ্টিও নিরর্থক হত যদি তিনি জীবদেহ সৃষ্টি করে তাতে প্রাণসংযোগ না ঘটাতেন। প্রাণই তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট দান। সুস্থ, সবল, সুন্দর শরীর যতক্ষণ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ততক্ষণই তা সমাদৃত। যে মুহূর্তে প্রাণবায়ুর নির্গমন সেই মুহূর্তেই যাকে নিয়ে এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস তার সবটুকুই হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়। এই প্রাণ প্রতিটি জীবের প্রতি ভগবানের দান। যার প্রতি মানুষের ভালোবাসা তীব্র তার প্রাণরক্ষা করতে, বিপদে তাকে প্রাণদান করতে মানুষ নিজের প্রাণত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না। যে পরমেশ্বর আমাদের প্রাণযুক্ত করেছেন আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ-অনুরাগ যে কত গভীর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে মানুষ ঈশ্বরের এই পরম উদার ও অতুলনীয় দানের বিষয়ে যত বেশি অবহিত ও জাগরিত তার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতায় তত বেশি পূর্ণ। কৃতজ্ঞতা এমনই এক মহনীয় গুণ যা ভাষায় ও ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। ভাষা ও ব্যবহারের সমন্বিত রূপই পূজা। পূজায় বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সেই কৃতজ্ঞতাই ধ্বনিত হয় এবং উপচার-নিবেদন সেই ভাবকেই পরিপুষ্ট করে। সুতরাং পূজা বা ভগবদারাধনা বিচারশীল, কৃতজ্ঞতা-সুন্দর মানবমনের স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রবণতা। কৃতজ্ঞতাবোধের গভীরতা মানুষকে তাঁর পূজার যোগ্যপাত্রে পরিণত করে। গভীরতার ব্যাপ্তি যার মধ্যে যত বেশি, যোগ্যতার মানও সেখানে তত উন্নত। যোগ্যতা বা শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যাকে বলে অধিকারিত্ব, সেই অধিকারিত্বই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে সেখানে লক্ষ্যসিদ্ধির পথে কিছু সহায়ক কারণও স্বীকৃত। আচার্য শংকরও সেকথা অনুমোদন করে বলেছেন : ''উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ।'' (বিবেকচূড়ামণি, ১৪) সহকারী কারণগুলির অন্যতম কাল বা সময়। সন্ধিকালীন পূজাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

সন্ধিপূজানুষ্ঠানের নির্দেশ 'তিথিতত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাসন্তী ও শারদীয়া দুর্গোৎসবের অষ্টমী

ও নবমী তিথির সন্ধি বা সংযোগকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজাই সন্ধিপূজা বা সন্ধিকালীন পূজা। বোধন, কল্পারম্ভ থেকে শুরু করে মহানবমী পর্যন্ত বিহিত পূজা দেবী দুর্গার প্রথম প্রকারের পূজা, অর্ধরাত্রিবিহিত পূজা দ্বিতীয় প্রকার পূজা এবং তৃতীয় প্রকার হল সন্ধিপূজা। শরৎকালের আশ্বিনমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথির শেষ দণ্ড অর্থাৎ চব্বিশ মিনিট এবং নবমীর প্রথম দণ্ডের চব্বিশ মিনিট, অষ্টমী-নবমীর এই মিলিত কাল 'উমামহেশ্বর তিথি' নামে পরিচিত। দুটি তিথির মিলনকালের এই পূজা অত্যন্ত ফলদায়ক। যদি সন্ধিকালটি মধ্যরাত্রে বা সন্ধ্যাবেলায় হয় তাহলে দশগুণ বা ত্রিগুণ ফলদায়ক হয়।

তবে সন্ধিকালে দেবী দুর্গার পূজার বিধান যেমন কোনও কোনও তন্ত্রে আছে আবার ওইসময় চামুণ্ডা পূজার নির্দেশও পাওয়া যায়। এইপ্রসঙ্গে পিচ্ছিলাতন্ত্রের বচন :

''সন্ধিযোগে তু চামুণ্ডা যোগিনীগণসংযুতা।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্বীত পূজনীয়া যথাবিধি॥''

—এর অর্থ হল, সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থব্যয় করে অর্থাৎ ব্যয়কুণ্ঠ না হয়ে সন্ধিকালে দেবী চামুণ্ডা ও যোগিনীদের বিধিপূর্বক পূজা করবে।

আবার অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, সন্ধিকালের আরাধ্যা দেবী দক্ষিণাকালী। তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

''অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডে তু নবম্যাঃ পূর্ব এব চ।
অর্ধরাত্রে মহাঘোরা আবির্ভূতা মহীতলে॥
তস্যাস্তু দক্ষিণাকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
পূজনীয়া সাধকেন্দ্রৈর্মহাবিভবিস্তরৈঃ॥''

অর্ধরাত্রে যখন ছিল অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড সেইসময় অত্যন্ত ভয়ংকর দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী, দক্ষিণাকালী পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ওইসময় উৎকৃষ্ট উপচার সহযোগে তাঁর পূজা করবেন। অবশ্য যেহেতু মূলশ্লোকে আছে—'দক্ষিণাকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী', তাই এমনও হতে পারে যে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী দেবী দুর্গাই সন্ধিকালে আরাধ্যা দক্ষিণাকালী।

আমরা এবার চামুণ্ডাপূজার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সন্ধিক্ষণে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী দেবী দুর্গা, চামুণ্ডা ও দক্ষিণাকালীর পূজার বিধান থাকলেও যেহেতু ওইকালে দেবী চামুণ্ডারূপেই বহু জায়গায় পূজিতা হন তাই আমাদের এখন আলোচ্য দেবী চামুণ্ডার ধ্যানমূর্তির বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চামুণ্ডার দুই প্রকার ধ্যানমন্ত্র সন্ধিপূজায় প্রযুক্ত হয়। প্রথমে আমরা কালিকাপুরাণোক্ত ধ্যানমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছি। ওই ধ্যানমন্ত্রের অর্থ—দেবী চামুণ্ডা নীলপদ্মের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা। ডানদিকের দুই হাতে উপরে ও নিচে যথাক্রমে খট্টাঙ্গ বা লৌহময় যষ্টি ও খড়্গ, বাঁদিকেও সেইরকম ঢাল ও রজ্জুরূপ অস্ত্র বা পাশাস্ত্র। তিনি মুণ্ডমালাধারিণী, পরিধানে তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম। ক্ষীণতনু, দীর্ঘদন্তবিশিষ্টা, দীর্ঘাঙ্গী ও ভীষণাকার তাঁর জিহ্বা লক্ লক্ করছে। কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা তিনি নাদরতা এবং সেইকারণে অত্যন্ত ভয়ংকর। অসুরের মুণ্ডহীন দেহ বা কবন্ধরূপ বাহনে তিনি উপবিষ্টা। সুবিস্তৃত তাঁর কর্ণ ও মুখাবয়ব। তিনি চামুণ্ডা কালী নামে অভিহিত। অথবা এই দেবী চামুণ্ডা ও তারা নামেও অভিহিত হন।

''নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা।
খট্টাঙ্গং চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে॥
বামে চর্ম চ পাশঞ্চ ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ।
দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্মধরাম্বরা॥
কৃশাঙ্গী দীর্ঘদংষ্ট্রা চ অতিদীর্ঘাতিভীষণা।
লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়না নাদভৈরবা॥
কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারশ্রবণাননা।
এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে॥''

[পাঠান্তর : এষা তারাহ্বয়া দেবী চামুণ্ডেতি চ গীয়তে।]

(কালিকাপুরাণ, ৬১।৮৮-৯১)

দক্ষিণাকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী, চামুণ্ডাকালী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ বা শারীরসৌষ্ঠব সমন্বিত কালীমূর্তির উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পূর্বোক্ত চামুণ্ডা কালীর বর্ণনা মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কালীমূর্তির আবির্ভাবের উল্লেখ দেবীমাহাত্ম্যের দুটি অধ্যায়ে রয়েছে। মহিষাসুরবধের পর দেবতারা আবার অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবারে অত্যাচারী

অসুরদ্বয়ের নাম শুম্ভ ও নিশুম্ভ। উৎপীড়িত দেবকুল হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুমায়ার স্তব আরম্ভ করলেন। প্রণতিপ্রধান অনিন্দ্যসুন্দর স্তবটি রয়েছে চণ্ডীগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে।

দেবতারা যখন ভগবতীর স্তবগানে মুখর তখন দেবী পার্বতী সেখানে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন কে তাঁদের উদ্দিষ্ট দেবতা যাঁর স্তুতিতে তাঁরা বিভোর হয়ে আছেন! ভগবতীর জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে ঘটল একটি অভাবনীয় ঘটনা।

জিজ্ঞাসু পার্বতীর শরীরকোশরূপ রত্নভাণ্ডার থেকে আবির্ভূতা হলেন দেবী কৌশিকী। তিনিই পার্বতীকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, নিশুম্ভাসুরের হাতে পরাজিত এবং শুম্ভাসুরের পরাক্রমে বিতাড়িত দেবতারা তাঁরই (অর্থাৎ কৌশিকীরই) স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছেন। অত্যাশ্চর্য এই কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গে স্মরণীয় শিবপুরাণের একটি বিবরণ যা থেকে আমরা জানতে পারি যে দৈত্যকুলতিলক শুম্ভ ও নিশুম্ভ কঠোর তপস্যায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এই বরলাভে কৃতার্থ হয় যে তারা হবে অজেয়। শুধু তাই নয়, তাদের এই প্রার্থনাও ব্রহ্মা মঞ্জুর করেন যে পুরুষমাত্রের তারা হবে অবধ্য। তবে দুর্জয় পরাক্রমশালিনী এমন এক কন্যার দ্বারা বধ্য হবে যিনি স্ত্রীশরীরকোশসমুদ্ভূতা এবং অযোনিজা। চণ্ডীগ্রন্থের পার্বতী-শরীর থেকে কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব ব্রহ্মার সেই প্রার্থনাপূরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, আমরা আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। পার্বতী-শরীর থেকে কৌশিকীর নির্গমনের ফলে পার্বতীর গৌরতনু মসীবর্ণে রূপান্তরিত হল এবং তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। দেবীমাহাত্ম্যে প্রথম প্রকার কালিকার বর্ণনা এই পর্যন্তই।

দ্বিতীয় প্রকার কালিকার বর্ণনা নিবদ্ধ হয়েছে চণ্ডীগ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। অসুররাজ শুম্ভ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ করল হিমালয় পর্বতে বিরাজিতা অভিমানদৃপ্তা দেবী কৌশিকীকে কেশাকর্ষণবিহ্বলা করে তার কাছে এনে উপস্থিত করতে। ধূম্রলোচন আদেশ পালনে তৎপর হয়ে উঠল। ষাট হাজার সৈন্যপরিবৃত হয়ে মহাবেগে সে দেবীর কাছে উপস্থিত হল। এখানে রয়েছে একটি মনোরম কথোপকথন : ধূম্রলোচনের সদম্ভ আদেশ ও সর্বশক্তির অধীশ্বরী দেবীর অসহায়তার মধুর পরিহাসোক্তি।

ধূম্রলোচন : (দেবী কৌশিকীর প্রতি) তুমি চলো শুম্ভ ও নিশুম্ভর কাছে। তুমি যদি সানন্দে আমার প্রভু (শুম্ভ-নিশুম্ভ)-র কাছে না যাও তবে আমি চুল ধরে টেনে তোমাকে অসহায় করে নিয়ে যাব।

দেবী কৌশিকী : দৈত্যরাজ তোমায় পাঠিয়েছেন। তুমি নিজেই শক্তিশালী, আবার সেনাপরিবেষ্টিতও বটে। তুমি যদি আমাকে এইভাবে জোর করে নিয়ে যাও তবে আমার করণীয় কিছু নেই।

দেবীর পরিহাসবচনে আহত ধূম্রলোচন তাঁর দিকে ছুটে গেল। কিন্তু অমিত শক্তির অধিকারিণী দেবী তীব্র হুংকারেই তাকে ভস্ম করে ফেললেন। অত্যন্ত বলবান ধূম্রলোচনের এই নিদারুণ দুঃখজনক পরিণতির কথা কানে পৌঁছালে শুম্ভ ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ চণ্ড-মুণ্ডকে আদেশ করল সর্বশক্তি দিয়ে অম্বিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার। যুদ্ধার্থে নির্গত হয়ে তারা দেখতে পেল অত্যুচ্চ হিমালয়-শিখরে সিংহপৃষ্ঠে সমারূঢ়া আনন্দবদনা দেবী অম্বিকাকে। প্রবল উৎসাহে ভরপুর, দৃপ্ত, সশস্ত্র চণ্ড-মুণ্ডকে দেখতে পেয়ে দেবী রোষানলে দীপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রবল ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল। তখনই ঘটল এক অলৌকিক সৃষ্টি। কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডলের ললাটদেশ থেকে আবির্ভূতা হলেন দেবী কালিকা। তিনিই চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধ। দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থ তাঁর অলৌকিক রূপ ও মহাশক্তির বর্ণনায় মুখর। সেখানে বলা হয়েছে : দেবীর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা কুঞ্চিত ললাটদেশ থেকে দ্রুতবেগে ভীষণাননা খড়্গ ও পাশধারিণী কালী নির্গতা হলেন। তিনি অদ্ভুত খট্টাঙ্গ বা লৌহনির্মিত যষ্টিবিশেষধারিণী, নরমুণ্ডের মালারূপ অলংকারযুক্তা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্কমাংসময়দেহযুক্তা এবং অত্যন্ত ভয়ংকরী। অতিবিস্তৃত তাঁর মুখ, জিহ্বা সঞ্চালন করার ফলে তিনি ভয়প্রদা, তাঁর চোখ কোটরগত ও রক্তবর্ণ এবং তিনি সিংহরবে দিঙ্‌মণ্ডল পূরণকারিণী। তিনি অসুরসৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত বেগে প্রবেশ করলেন এবং অসুরদের হত্যা করতে করতে সৈন্যদের ভক্ষণ করতে লাগলেন।

দেবী কালিকা অশ্বসহ যোদ্ধা ও সারথিসহ রথকে নিজের মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন এবং ভীষণভাবে চর্বণ করতে লাগলেন।

''ভ্রূকুটিকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্ বলম্॥
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি-যোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥
তথৈব যোধং তুরগৈঃ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ত্যতিভৈরবম্॥''

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৭।৬-১১)

সন্ধিপূজায় চামুণ্ডা কালীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীর উপরিউক্ত রূপবৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। কালিকা-পুরাণের অন্তর্গত পূর্বোক্ত ধ্যানমন্ত্রে এবং চণ্ডীগ্রন্থের ধ্যানমন্ত্রে চামুণ্ডার রূপের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালিকাপুরাণে দেবী চতুর্বাহু, চণ্ডীতেও তিনি চতুর্ভুজা। তবে দেবীর করধৃত অস্ত্রের মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কালিকাপুরাণে বর্ণিত চামুণ্ডা খট্টাঙ্গ, খড়্গ, ঢাল ও পাশাস্ত্রধারিণী। কিন্তু চণ্ডীবর্ণিত চামুণ্ডার হাতে শোভা পাচ্ছে খড়্গ, পাশাস্ত্র ও খট্টাঙ্গ। চতুর্থ অস্ত্রের উল্লেখ নেই। তবে এমনও হতে পারে যে চণ্ডীবর্ণিত চামুণ্ডা দ্বিভুজা। তাঁর একটি হাতে যুগপৎ খড়্গ ও পাশাস্ত্র এবং অপর হাতে খট্টাঙ্গ। তবে উভয়েই নরমুণ্ডমালাভূষিতা ও ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা। দেবী চামুণ্ডার দেহ উভয় স্থলের বর্ণনায় অস্থিচর্মসার (কৃশাঙ্গী, শুষ্কমাংসা) ও ভয়ংকর। চণ্ডীতে তিনি 'জিহ্বাললনভীষণা', কালিকাপুরাণে তিনি 'লোলজিহ্বা'; চণ্ডীতে তিনি 'নিমগ্নারক্তনয়না', কালিকাপুরাণে তিনি 'নিম্নরক্তনয়না'। কিন্তু চণ্ডীবর্ণিত চামুণ্ডা 'অতিবিস্তারবদনা' হলেও কালিকাপুরাণে তিনি 'বিস্তারশ্রবণাননা'—মুখাবয়ব ও কর্ণ দুইই অতি বিস্তৃত। কালিকাপুরাণের চামুণ্ডা দীর্ঘদংষ্ট্রাবিশিষ্টা, কিন্তু চণ্ডীতে তাঁর দংষ্ট্রার কোনও বর্ণনা নেই। চণ্ডীতে দেবীবাহনের উল্লেখ নেই, কালিকাপুরাণে দেবী 'কবন্ধবাহনাসীনা'।

আরও কথা, চণ্ডীবর্ণিত চামুণ্ডার অসুরদলন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বসমেত শত্রুসৈন্য ও রথকে নিজের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে চর্বণ ইত্যাদি অলৌকিক শক্তির অত্যাশ্চর্য বহিঃপ্রকাশ আমাদের গীতায় ভগবানের করালরূপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে চামুণ্ডা কালী, গীতায় সাক্ষাৎ কালরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন—

''কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।'' (গীতা, ১১।৩২)

এখন আমরা চামুণ্ডা নামের অর্থের দিকে দৃষ্টি দেব। চণ্ডীগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধাভিলাষী হয়ে এসেছিল চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই অসুর ও তাদের সহকারী অগণিত সৈন্য। অসুরসৈন্যরাই প্রথমে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু অল্পক্ষণেই অমিতশক্তির অধিকারিণী দেবীর হাতে তারা হয় নিহত অথবা বিতাড়িত হয়েছিল। অগণিত সৈন্যক্ষয়ে বিচলিত চণ্ড ও মুণ্ড এবার নিজেরাই চণ্ডিকা-নিধনেচ্ছায় দেবীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। অসংখ্য বাণবর্ষণ ও চক্রনিক্ষেপের দ্বারা তারা ভীষণনয়না কালীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, বহুসংখ্যক চক্র দেবীর মুখগহ্বরে প্রবেশ করে শোভা পেতে লাগল। দেখে মনে হয়েছিল যেন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলের মধ্যে অসংখ্য সূর্য দেদীপ্যমান। চণ্ডমুণ্ডের প্রবল প্রগল্‌ভতার জবাবে দেবী মহাখড়্গ উত্তোলন করে চণ্ডের দিকে ধেয়ে গেলেন এবং খড়্গদ্বারা তার শিরশ্ছেদ করলেন। চণ্ড-নিধনে ক্ষুণ্ণ মুণ্ড ক্রোধে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হলে দেবী তাকেও খড়্গাঘাতে হত্যা করলেন। এরপর দেবী চণ্ড ও মুণ্ডের কর্তিত মস্তক কৌশিকীর কাছে নিয়ে এসে বললেন, এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি তোমায় চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই মহাপশু উপহার দিলাম। উপহার পেয়ে কল্যাণময়ী কৌশিকী মধুর ভাষায় দেবী কালিকাকে বললেন : যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডকে নিয়ে

এখানে উপস্থিত হয়েছ তাই পৃথিবীতে তুমি চামুণ্ডা নামে প্রখ্যাত হবে।

কৌশিকীকে নিহত চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক দুটি উপহার দেওয়ার সময় কালীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : ''ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ। যুদ্ধযজ্ঞে...(৭।২৪)।''—এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আমার দ্বারা তোমাকে চণ্ড ও মুণ্ডরূপ দুই মহাপশু উপহার দেওয়া হল। দেবাসুর যুদ্ধটি এখানে শুধুমাত্র আঘাত-প্রত্যাঘাত, রক্তপাত বা জয়-পরাজয়মূলকই নয়। যুদ্ধ যে যজ্ঞমাত্র মেধসমুনি এখানে স্পষ্টত তা-ই বললেন। হিংসা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হলেও যজ্ঞে পশুবধ শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় তা অনিন্দিত ও প্রশংসার যোগ্য। দেবী কালিকা তাই চণ্ড-মুণ্ডরূপ মহাপশুর বলিদানের মাধ্যমে যজ্ঞকে সর্বাঙ্গসুন্দর করলেন। যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। যুদ্ধরূপ যজ্ঞে নিহত ব্যক্তিরও স্বর্গলাভ অনিবার্য।

আবার একটু অন্য ধরনের ব্যাখ্যারও এখানে অবকাশ আছে। চণ্ড-মুণ্ড বিনাশের সময় দেবী যে মহাসি বা মহাখড়্গ উত্তোলন করেছিলেন তা যেন গীতোক্ত অসঙ্গশস্ত্র, দ্বৈতবুদ্ধিপ্রণাশক মহাস্ত্র। সেই মহাস্ত্র উত্তোলন করার পর তিনি শুম্ভের কেশাকর্ষণ করেছিলেন, যে কেশ অজ্ঞান-প্রলোভনের প্রতীক। তাই জীবের আসুরবৃত্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা দ্বৈতপ্রপঞ্চের বোধ সমূলে উন্মূলিত করে দয়াময়ী চামুণ্ডা কালিকা চরম দয়ারই প্রকাশ ঘটালেন। আবার চণ্ড ও মুণ্ড যেন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতীক। প্রবৃত্তির বিনাশের পর প্রয়োজন নিবৃত্তির বিনাশসাধন। নিবৃত্তির বিনাশের মাধ্যমে জীবত্বের লেশটুকুও ঘুচিয়ে দিতে উন্মুখ করুণাময়ী সর্বগ্রাসী জননী। তাই মুণ্ডাসুরও সমরনিষ্ঠুর মাতার হস্তে ধ্বংস হয়েও মাতৃহৃদয়ের বদান্যতায় দেবীসাযুজ্য লাভ করেছেন। সন্ধিপূজায় করাল, ভীষণরূপের মাধ্যমে কল্যাণময়ী দেবীর আরাধনা বস্তুত সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অনুকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে দুঃখ, দৈন্য, হতাশা, বিভীষিকাকে বরণ করার, চরম প্রতিকূলতার মধ্যে অবিচলিত থেকে আধ্যাত্মিক চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বীরোচিত প্রয়াস। এ যেন 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'য় অভিস্নাত হওয়া। এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা মাতা' শীর্ষক অসামান্য কবিতার কয়েকটি অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি :

''মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।''

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে পূজানুষ্ঠানে কাল বা সময়ের একটি ভূমিকা রয়েছে। পূজাপদ্ধতির বিধায়ক ও প্রবর্তক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তিথিকৃত্যগুলিতে তিথির অপরিসীম গুরুত্বকে মেনে নিয়েছেন। একটি প্রচলিত কথা : 'বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ'। শাস্ত্রবিহিত কালের সীমার মধ্যে একটি আহুতিই যথেষ্ট, অবিহিত সময়ে লক্ষ-কোটি আহুতির চেয়ে। সন্ধিপূজায়ও তাই লক্ষ করা যায় মাত্র আটচল্লিশ মিনিট-ব্যাপী সন্ধিকালে পূজাজ্ঞ ঋষিরা বিস্তৃত এক পূজার বিধান দিয়েছেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই সন্ধিকালকেই পূজার জন্য বেছে নেওয়া হল? এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে যেহেতু শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধই গ্রাহ্য তাই ওইসময়ই পূজা বিহিত হওয়ায় তা মেনে চলতে হবে। বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশটিকে উদ্ধৃত করেন :

''তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥''

—(করণীয়-অকরণীয় স্থির করতে শাস্ত্রবাক্যই তোমার প্রমাণ। শাস্ত্রনির্দেশকে জেনে তুমি যথাযোগ্য কর্ম সম্পাদন করতে পার।) তবুও অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায় বিদগ্ধ, সর্বজ্ঞতুল্য শাস্ত্রকাররা কেন সন্ধিকালকে চামুণ্ডাপূজার জন্য বেছে নিলেন। নিরন্তর প্রবাহিত কালস্রোত নিজের মতোই সকলকে ব্যস্ত রেখেছে, সেখানে বিরাম-বিশ্রান্তির যেন অবকাশটুকুও নেই। সেই গতিই আবার

আকর্ষণ-বিকর্ষণের গতি, যার ইঙ্গিত রয়েছে গীতার শ্লোকে : 'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে' (শুক্ল ও কৃষ্ণ বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দুটি গতি জগতের চিরন্তন বলে স্বীকৃত)। সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণে তোলপাড় হচ্ছে আমাদের মন। মনের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী নিরবচ্ছিন্ন গতির মাঝখানে আছে এক শান্তভূমি, যেমন ক্রমাগত বয়ে চলা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে আছে নিমেষের স্থিতাবস্থা। এ যেন নদীর দুকূল ধরে জোয়ারের জল উজান পথে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানটা স্থির। অন্যরকম সাদৃশ্য দেখিয়েও বলা যায় যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মাঝে আছে নিরপেক্ষ এলাকা যা আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাবমুক্ত। কালপ্রবাহের মধ্যে তিথির অবসান ও আরম্ভেও রয়েছে এক বিশ্রামস্থল যখন কাল ও প্রকৃতি প্রশান্তভাব ধারণ করে, যা সাধকের সাধনগতিকে ত্বরান্বিত করে। এজন্যই ত্রিসন্ধ্যায় ভগবদারাধনার বিধান দিয়েছেন শাস্ত্রকারেরা। সাধক-শিরোমণিদের তাই এই অমোঘ উপদেশ : 'সন্ধিকো পকড়ো'—সন্ধিকালকে আশ্রয় করো। শুক্লপক্ষের সাতটি তিথি অতিক্রান্ত হবার পর আসে মহাষ্টমী। মহাষ্টমী পূর্ণ হবার পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত হয় মহাসন্ধিক্ষণ যখন সংযোগ ঘটে মহানবমীর এবং তাকে উপলক্ষ করে অবশিষ্ট সাতটি তিথির। এই সন্ধিকালেই জগজ্জননী আবির্ভূতা হন স্বমহিমায়। তাঁর চরণানুগত সন্তান ওইসময় প্রবুদ্ধ থেকে তাঁর আরাধনা করে হন কৃতার্থ।

সন্ধিপূজায় চামুণ্ডার আরাধনা সাধারণত রাজসিক উপচারেই সম্পাদিত হয়। মহাপূজার অন্তর্গত চারটি অঙ্গের মধ্যে বলতে গেলে তিনটি অঙ্গই এখানে উপস্থিত। নেই শুধু হোম। স্বল্পসময়ব্যাপী সন্ধিপূজায় ষোড়শোপচার পূজা, বলি, অন্নভোগ নিবেদন, নীরাজনা এবং স্তোত্রপাঠও উপযুক্ত মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিপূজার দুটি আকর্ষণীয় উপচার অষ্টোত্তরশত রক্তপদ্ম ও অষ্টোত্তরশত প্রজ্বলিত দীপ। দীপ-নিবেদনের মন্ত্রটিও অতি চমৎকার :

''সংসারধ্বান্তনাশায় পবিত্রজ্যোতিরাপ্তয়ে।
দত্তেয়ং গৃহ্যতাং দেবি কৃপয়া দীপমালিকা॥''

জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহরূপ সংসার অজ্ঞান-অন্ধকার বই আর কিছু নয়। মাতৃস্বরূপের অনববোধ বা অজ্ঞানই সংসার-দুঃখের একমাত্র কারণ। তাই জ্যোতির্ময়ী জননীর আলোকে উদ্ভাসিত হবার লক্ষ্যেই পূজক দীপ নিবেদনের পর দীপমালা গ্রহণ করতে জগন্মাতার কাছে সানুনয় প্রার্থনা জানাচ্ছেন। অন্ধকারের ঘন আবরণ ছিন্নভিন্ন করে আলোকের ঝরনাধারায় অভিস্নাত হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য। চামুণ্ডার আরাধনা সেই লক্ষ্যের নিশ্চিত পরিপূরক।